

কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৩

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২৩

সূরা বাকারাহ ২৪৪-২৮৬ আয়াত

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

২৮৪. আল্লাহর জন্যই যা আছে আসমানসমূহে ও যা আছে যমীনে। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ সেগুলোর হিসেব তোমাদের কাছ থেকে নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছে তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ قَدِيرٌ) এ আয়াত নাযিল হলে বিষয়টি সাহাবীদের ওপর খুব কঠিন হয়ে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসল এবং জানু ভরে বসে পড়ে বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সালাত, সিয়াম, জিহাদ এবং দানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা আমাদের সাধের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এখন যে আয়াত নাযিল হয়েছে তা পালন করার শক্তি আমাদের নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমরা কি ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মত বলতে চাও আমরা গুনলাম আর মানলাম না? বরং তোমাদের বলা উচিত: আমরা গুনলাম ও মানলাম। হে আমাদের রব! আমাদের ক্ষমা করুন, আপনার কাছেই আমাদের প্রত্যাবর্তন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান হা:১২৭)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার রুবুবিয়্যাহর আলোচনা করা হয়েছে। তিনি যেমনি আকাশ ও জমিনের একচ্ছত্র মালিক। সকল কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও রাজত্ব তাঁর হাতে, তেমনি কাউকে ক্ষমা করা আর না করার কর্তৃত্বও তাঁর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা তার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়ে জাহান্নাত দিতে পারেন, এটা আল্লাহ তা ‘আলার অনুগ্রহ। আবার যাকে ইচ্ছা তার অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন, এতে তিনি জালিম হবেন না বরং তিনি ন্যায়পরায়ণ। কাউকে ক্ষমা করা আর না করার কর্তৃত্ব কোন নাবী-রাসূল, ওলী-আউলিয়া ও পীর-বুয়ুর্গকে দেয়া হয়নি।

ইবনু উমার (রাঃ) বলেন: (إِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ) এ আয়াতটি তার পরের আয়াত তথা ২৮৬ নং আয়াত দ্বারা মানসূখ বা রহিত করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫৪৬)

বুখারী-মুসলিম এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটিও এর সমর্থন করে, “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদীয়মান খেয়ালের কোন বিচার করবেন না, যে পর্যন্ত না তা কাজে পরিণত করবে অথবা মুখে উচ্চারণ

করবে। (বুখারী ২৫২৮-মুসলিম ১২৭নং) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তরে উদিত খেয়ালের কোন হিসাব হবে না। কেবল সেই খেয়ালের হিসাব হবে, যা কাজে পরিণত করা হবে। (উক্ত) আয়াতের ব্যাপারে ইমাম ইবনে জারীরের বিপরীত মন্তব্য রয়েছে। তাঁর খেয়াল হল, আয়াতকে রহিত করা হয়নি। কেননা, হিসাব হলেই যে শাস্তি হবে তা জরুরী নয়। অর্থাৎ, এটা জরুরী নয় যে, মহান আল্লাহ যারই হিসাব নিবেন, তাকেই শাস্তি দিবেন। বরং তিনি হিসাব তো প্রত্যেকেরই নিবেন, কিন্তু অনেক মানুষ এমনও থাকবে যাদের হিসাব নেওয়ার পর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। কিছু লোকের সাথে তো এমনও ব্যবহার করা হবে যে, তাদের একটি একটি পাপকে স্মরণ করিয়ে স্বীকারোক্তি নিয়ে বলবেন, দুনিয়ায় এই পাপগুলোকে আমি গোপন করে রেখেছিলাম। যাও, আজ এগুলোকে আমি মাফ করে দিলাম। (এই হাদীস সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর) কোন কোন উলামা বলেছেন, এখানে ‘নাসখ’ (রহিত করণ) পারিভাষিক অর্থে বলা হয়নি, বরং কখনো কখনো ‘নাসখ’ ব্যবহার করা হয় কোন জিনিসকে আরো পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করে দেওয়ার অর্থে। তাই সাহাবাদের অন্তরে এই আয়াত থেকে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল সেটাকে দূর করে দেওয়া হল

{لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} এই আয়াত এবং “অবশ্যই আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরের খেয়ালের বিচার করবেন না---। এই হাদীস দ্বারা। এভাবে উভয় আয়াতের একটিকে ‘নাসিখ’ এবং অপরটি ‘মানসূখ’ ভাবার কোন প্রয়োজন হবে না।

آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

২৮৫. রাসূল তার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তার কাছে নাযিল করা হয়েছে তার উপর ঈমান এনেছেন এবং মুমিনগণও। প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণের উপর। আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলেঃ আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব। আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল।

এ আয়াত দু’টি হচ্ছে সম্পূর্ণ সূরার এমনি এক পরিশিষ্ট ও সংক্ষিপ্তসার যাতে সূরার মূল আলোচিত বিষয়গুলোর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এতে ঈমানের ধরন ও সত্যিকার মু’মিনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে এবং বিনয়ের সাথে আল্লাহ তা‘আলার কাছে দু‘আ করার আদব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

ফযীলত: ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি সূরা বাকারার এ আয়াত দু’টি রাতে তেলাওয়াত করবে তার জন্য এ দু’টিই (রাতের ইবাদত হিসেবে ও সকল অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য) যথেষ্ট। (সহীহ বুখারী হা: ৪০০৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমাকে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াত আরশের নীচের ধনভাণ্ডার থেকে দেয়া হয়েছে। আমার পূর্বে কোন নাবীকে তা দেয়া হয়নি। (হাকিম: ১/৫৫৯, সিলসিলা সহীহাহ হা:১৪৮২)

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা আকাশ-জমিন সৃষ্টি করার দু’হাজার বছর আগে একটি কিতাব লিখেছেন তা থেকে সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। যে বাড়িতে তিন রাত এ আয়াতদ্বয় তেলাওয়াত করা হবে সে বাড়িতে শয়তান থাকবে না। (তিরমিযী হা: ২৮৮২, সনদ সহীহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা— রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগৎ সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে পরম দয়ালু আল্লাহ তা‘আলা স্বহস্তে তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এশার নামাযের পর এ দু’টি আয়াত পাঠ করলে তা তাহাজ্জুদ নামাযের শ্রুতিভিষিক্ত হয়ে যায়। মুস্তাদরাক হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ আল্লাহ তা‘আলা এ দু’টি আয়াত দ্বারা সূরা বাকারার সমাপ্ত করেছেন। আরশের নিম্নস্থিত বিশেষ ভাণ্ডার থেকে এ দু’টি আয়াত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমরা বিশেষভাবে এ দু’টি আয়াত শিক্ষা কর এবং নিজেদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দাও।

এ ছাড়াও সূরা বাকারার শেষ দু’টি আয়াতের আরো অনেক ফযীলত রয়েছে।

এ আয়াতদ্বয়ের অর্থগত বৈশিষ্ট্য অনেক। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য এই যে, সূরা বাকারার অধিকাংশ বিধি-বিধান সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে। যথা বিশ্বাস, ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র সামাজিকতা ইত্যাদি। সর্বশেষ এ আয়াতদ্বয়ের প্রথম আয়াতে অনুগত মু‘মিনদের প্রশংসা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ তা‘আলার যাবতীয় বিধান শিরোধার্য করে নিয়েছে এবং বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া হয়েছে, যা এ আয়াতদ্বয়ের পূর্ববর্তী আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের মনে দেখা দিয়েছিল। প্রশ্নটি ছিল এই - যখন এ আঘাত অবতীর্ণ হলোঃ

وَأِنْ تَبْذُؤْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُخَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ
কর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা‘ আলা তোমাদের কাছে থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ও ত্রুটি বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যত ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেওয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রসূল (সা)-এর কাছে আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্লনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্লনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়। মহানবী (সা) আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে আপাতত আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন-মু‘মিনের কাজ তো মেনে নেওয়া। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করা উচিত নয়। আল্লাহ তা‘ আলা প্রত্যেক আদেশ শুনে তোমাদের একথা বলা উচিতঃ

অর্থ্যাৎ- হে আমাদের পালনকর্তা ! আমরা আপনার নির্দেশ শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রভু! যদি নির্দেশ পালনে আমাদের কোন ত্রুটি বা ভুল হয়ে থাকে, তবে তা ক্ষমা করুন। কেননা, আমাদের সবাইকে আপনারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।”

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ মত কাজ করলেন; যদিও তাঁদের মনে এ খটকা ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা এ দৃষ্টি আয়াত নাযিল করেন। প্রথম আয়াতে মুসলমানদের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে, যে আয়াত সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। প্রথম আয়াতটি হচ্ছেঃ

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

অর্থ্যাৎ রাসূল বিশ্বাস রাখেন ঐ বিষয়ের প্রতি, যা তাঁর কাছে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে মহানবী (সা)-এর প্রশংসা করা হয়েছে এবং তাঁর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে 'রসূল' শব্দ ব্যবহার করে তাঁর সম্মান ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর বলেছেনঃ وَالْمُؤْمِنُونَ অর্থ্যাৎ রাসূল (সা)-এর যেমন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রতি বিশ্বাস আছে তেমনি সাধারণ মু'মিনদেরও রয়েছে। এতে প্রথমে পূর্ণ বাক্যে রাসূল (সা)-এর বিশ্বাস বর্ণিত হয়েছে, এরপর মু'মিনদের বিশ্বাস পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বর্ণনাজঙ্গিতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও আসল বিশ্বাসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সকল মুসলমান অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বাসের স্তরে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশ্বাস প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শ্রবণের ভিত্তিতে এবং অন্য মুসলমানগণের বিশ্বাস 'অদৃশ্য বিশ্বাস' এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখার ভিত্তিতে।

এরপর মহানবী (সা) ও অন্য মু'মিনদের অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত ঈমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ ঈমান হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি পূর্ণতার যাবতীয় গুণে তাঁর গুণান্বিত হওয়ার প্রতি, ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থাবলী ও পয়গম্বরগণের সকলেরই সত্য হওয়ার প্রতি। এরপর বলা হয়েছে যে, এ উম্মতের মু'মিনগণ পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত আল্লাহ্ তা' আলায় পয়গম্বরগণের মধ্যে প্রভেদ করবে না যে, কাউকে পয়গম্বর মানবে এবং কাউকে মানবে না। যেমন, ইহুদীরা হযরত মূসা (আ)-কে এবং খৃস্টানরা হযরত ঈসা (আ)-কে পয়গম্বর মানে, কিন্তু শেষ নবী (সা)-কে পয়গম্বর মানে না। এ উম্মতের প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার কোন পয়গম্বরকে অস্বীকার করে না। এরপর সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। কারণ, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশ অনুযায়ী মুখে এ বাক্য বলেছিলেনঃ

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

২৮৬. আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না যা তার সাধ্যাতীত। সে ভাল যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই, আর মন্দ যা কামাই করে তার প্রতিফল তার উপরই বার্তায়। হে আমাদের রব! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের উপর তেমন বোঝা চাপিয়ে দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, তোমাদের অন্তরে যা আছে, প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। আয়াতের আসল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তোমরা স্বেচ্ছায় যেসব কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার হিসাব নেবেন। অনিচ্ছাকৃত কু-চিন্তা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি এর অন্তর্ভুক্তই ছিল না। কিন্তু আয়াতের ভাষা বাহ্যতঃ ব্যাপক ছিল। এতে বোঝা যেত যে, অনিচ্ছাকৃত ধারণারও হিসাব নেয়া হবে। এ আয়াত শুনে সাহাবায়ে কেরাম অস্থির হয়ে গেলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয় করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতদিন আমরা মনে করতাম যে, আমাদের ইচ্ছাকৃত কাজেরই হিসাব হবে। মনে যেসব অনিচ্ছাকৃত কল্লনা আসে, সেগুলোর হিসাব হবে না। কিন্তু এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি কল্লনারও হিসাব হবে। এতে তো শাস্তির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া সাংঘাতিক কঠিন মনে হয়।

মহানবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য জানতেন, কিন্তু উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলা সমীচীন মনে করলেন না, বরং ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে আপাততঃ আদেশ দিলেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসে, তা সহজ হোক কিংবা কঠিন - মুমিনের কাজ হলো তা মেনে নেয়া। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশমত কাজ করলেন; যদিও তাদের মনে এ সংশয় ছিল যে, অনিচ্ছাকৃত কল্লনা ও কু-চিন্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে মুসলিমদের আনুগত্যের প্রশংসা করেন এবং বিশেষ ভঙ্গিতে ঐ সন্দেহের নিরসন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজের নির্দেশ দেন না।

কাজেই অনিচ্ছাকৃতভাবে যেসব কল্লনা ও কু-চিন্তা অন্তরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, এরপর সেগুলো কার্যে পরিণত করা না হয়, সেসব আল্লাহ তা'আলার কাছে মাফযোগ্য। যেসব কাজ ইচ্ছে করে করা হয়, শুধু সেগুলোরই হিসাব হবে। কুরআনে বর্ণিত এ ব্যাখ্যার ফলে সাহাবায়ে কেরামের মানসিক উদ্বিগ্ন দূর হয়ে যায়। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৪১২, ১/৩৩২; মুসলিম: ১২৫] তারপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে একটি বিশেষ দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন।

যাতে ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ কোন কাজ হয়ে যাওয়ার পর ক্ষমা প্রার্থনার পদ্ধতি শিখিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের মত শাস্তিও যেন এ উম্মতের উপর না আসে, তার জন্য বিশেষভাবে দো'আ করতে বলা হয়েছে।

আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।

অর্থাৎ আল্লাহর কাছে মানুষের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দায়িত্ব বিবেচিত হয়। মানুষ কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে না অথচ আল্লাহ তাকে সে কাজটি না করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, এমনটি কখনো হবে না। অথবা প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ বা জিনিস থেকে দূরে থাকার সামর্থ্যই মানুষের ছিল না, সেক্ষেত্রে তাতে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে, নিজের শক্তি-সামর্থ্য আছে কিনা, এ সম্পর্কে মানুষ নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কিসের শক্তি-সামর্থ্য ছিল আর কিসের ছিল না-এ সিদ্ধান্ত একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই উপর বর্তাবে।

এটি আল্লাহ প্রদত্ত মানবিক ইখতিয়ার বিধির দ্বিতীয় মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে কাজ করেছে তার পুরস্কার পাবে। একজনের কাজের পুরস্কার অন্যজন পাবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে যে দোষ করেছে সেজন্য পাকড়াও হবে। একজন দোষ করবে আর অন্যজন পাকাড়ও হবে, এটা কখনো সম্ভব নয়। তবে এটা সম্ভব, এক ব্যক্তি কোন সংকাজের ভিত্তি রাখলো এবং দুনিয়ায় হাজার বছর পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো, এক্ষেত্রে এগুলো সব তার আমলনামায় লেখা হবে। আবার অন্য এক ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ভিত্তি রাখলো এবং শত শত বছর পর্যন্ত দুনিয়ায় তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। এ অবস্থায় এ গুলোর গোনাহ ঐ প্রথম জালেমের আমলনামায় লেখা হবে। তবে এক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ যা কিছু ফল হবে সবই হবে মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি। মোটকথা যে ভালো বা মন্দ কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা, সংকল্প, প্রচেষ্টা ও সাধনার কোন অংশই নেই, তার শাস্তি বা পুরস্কার সে পাবে, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কর্মফল হস্তান্তর হওয়ার মতো জিনিস নয়।

হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলে।

অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তীরা তোমার পথে চলতে গিয়ে যেসব পরীক্ষা, ভয়াবহ বিপদ, দুঃখ-দুর্দশা ও সংকটের সম্মুখীন হয়, তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো। যদিও আল্লাহর রীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের অনুসরণ করার সংকল্প করেছে, তাকেই তিনি কঠিন পরীক্ষা ও সংকটের সাগরে নিক্ষেপ করেছেন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হলে মু'মিনের কাজই হচ্ছে, পূর্ণ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার মোকাবিলা করা, তবুও মু'মিনকে আল্লাহর কাছে এই দোয়াই করতে হবে যে, তিনি যেন তার জন্য সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা সহজ করে দেন।

হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, তা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না।

অর্থাৎ সমস্যা ও সংকটের এমন বোঝা আমাদের ওপর চাপাও, যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের আছে। যে পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা আমাদের আয়ত্বাধীন তেমনি পরীক্ষায় আমাদের নিক্ষেপ করো। আমাদের

সহ্য ক্ষমতার বেশী দুঃখ-কষ্ট-বিপদ আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। তাহলে আমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবো।

এই দোয়াটির পূর্ণ প্রাণসত্তা অনুধাবন করার জন্য এর নিম্নোক্ত প্রেক্ষাপটটি সামনে রাখতে হবে। হিজরতের প্রায় এক বছর আগে মি'রাজের সময় এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তখন মক্কায় ইসলাম ও কুফরের লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। মুসলমানদের মাথায় বিপদ ও সংকটের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল। কেবল মক্কাতেই নয়, আরব ভূ-খণ্ডের কোথাও এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে কোন ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তার জন্য আল্লাহর যমীনে বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েনি। এ অবস্থায় মুসলমানদের আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করার নির্দেশ দেয়া হলো। দানকারী নিজেই যখন চাওয়ার পদ্ধতি বাতলে দেন তখন তা পাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়। তাই এই দোয়া সেদিন মুসলমানদের জন্য অসাধারণ মানসিক নিশ্চিন্ততার কারণ হয়। এছাড়াও এই দোয়ায় পরোক্ষভাবে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়, নিজেদের আবেগ অনুভূতিকে কখনো অসঙ্গত ও অনুপযোগী ধারায় প্রবাহিত করো না বরং সেগুলোকে এই দোয়ার ছাঁচে ঢালাই করো। একদিকে নিছক সত্যানুসারিতা ও সত্যের প্রতি সমর্থন দানের কারণে লোকদের ওপর যেসব হৃদয় বিদারক জুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্য তিক্ততার নামগন্ধও নেই। একদিকে এই সত্যানুসারীরা যেসব শারীরিক দুর্ভোগ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল সেগুলো দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়াগুলো দেখুন, যাতে পার্থিব স্বার্থের সামান্য প্রত্যাশাও নেই, একদিকে সত্যানুসারীদের চরম দুরবস্থা দেখুন এবং অন্যদিকে এই দোয়ায় উৎসারিত উন্নত ও পবিত্র আবেগ-উদ্দীপনা দেখুন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সে সময় ঈমানদারদের কোন ধরনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন দেয়া হচ্ছিল, তা সঠিক ও নির্ভুলভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

ফুটনোট

- সূরা বাকারাহের শেষ দুই আয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। তাই আমরা চেষ্টা করবো এই দুই আয়াত মুখস্ত করে নেওয়ার। এই দোয়াগুলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শিখিয়ে দিচ্ছন। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে এই দোয়াগুলো কাজে লাগবে।
- আল্লাহ কারোর ওপর তার সামর্থের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না।
- প্রত্যেক ব্যক্তি যে নেকী উপার্জন করেছে তার ফল তার নিজেরই জন্য এবং যে গোনাহ সে অর্জন করেছে, তার প্রতিফলও তারই উপর বর্তাবে।
- ঈমান আনার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে- আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাগণ, তার কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলগণের উপর।
- মুমিন রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করে না।
- ঈমানদারদের সামনে যখন আল্লাহর কোনো বিধান আসে তখন তারা বলে- আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি।